

উত্তরের জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পূর্ব-পশ্চিমে একটা রেখা টেনে আইভরিকোস্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই রেখার নাম জোন অব কনফিডেন্স। জোন অব কনফিডেন্স পার হওয়ার সময় গা হুমহুম করে উঠলো। গত বছর এই নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করতে গিয়ে জাতিসংঘের সৈনিকদের হাতে বন্দী হয় সরকারী মিলিশীয়াবাহিনী ইয়াং পেট্রিয়টের একটি দল। জাতিসংঘের সৈনিকরা তাদের সাথে মধুর ব্যবহার না করে যদি গুলি করে মেরেও ফেলতো তাতে কারো কিছু করার ছিল না। আইভরিকোস্টের মানচিত্রে জোন অব কনফিডেন্সকে দেখানো হয়েছে একটি শাদা রেখা হিসাবে। এর মানে হলো এটি শান্তির রেখা। এই রেখা অতিক্রমকারীই অশান্তি সৃষ্টিকারী। আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী না, শান্তির রক্ষক। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শান্তিরেখা ছিন্ন করে এপারে, শান্তির বারতা পৌঁছে দিতে।

জোন অব কনফিডেন্সের উত্তরাংশ গেরিলা নেতা গুইলামো সরোর দখলে। তাকে রাজনৈতিক সমর্থন দিচ্ছেন আইভরিকোস্টের বিদ্রোহী নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলাসান উয়াত্তারা। উত্তরাংশ মূলত মুসলমান এবং অভিবাসীদের আবাসস্থল। এইসব অভিবাসীরা বেশীরভাগই এসেছে বুরকিনা ফাসো, নিজার এবং মালি থেকে। আলাসান উয়াত্তারা নিজেও হাফ বুরকিনা। তার মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর রাজকন্যা, যিনি ২০০৫ এর শেষের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত আইভরিকোস্টের লক্ষ লক্ষ মানুষ শোক প্রকাশ করতে নেমে এসেছিল রাজপথে। মূলত এরা সবাই মুসলমান, উয়াত্তারার প্রতি সমর্থন প্রদর্শনই ছিল এই নেমে আসার উদ্দেশ্য। দেশের সমস্ত মসজিদে বিশেষ মুনাজাত এবং ভোজসভার আয়োজন চলে সেই সময়। এতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেন আলাসান উয়াত্তারা।

ভেবেছিলাম জোন অব কনফিডেন্স এক চিলতে একটা রেখা। সাঁই করে পার হয়ে যাবো। কিন্তু রেখাটি পার হতে গিয়ে টের পেলাম প্রায় দশ কিলোমিটার প্রশস্ত এই রেখা, যার দু'পাশে রয়েছে সুসজ্জিত চেকপোস্ট। জাতিসংঘের গাড়ি এবং ভেতরে দু'জন ইউনিফর্ম পরা সামরিক কর্মকর্তা দেখে চেকপোস্টের মরক্কান সৈনিকরা তেমন কিছুই চেক করলো না। ওরা শুধু হাত তুলে সেলুট ঠুকলো, জবাবে আমরাও হাত তুলে তার জবাব দিলাম। শেষ চেকপোস্টটি পার হবার কয়েক মিনিটের মাথায়ই আরেকটি চেকপোস্ট। ভাঙা নড়বড়ে একটা কাঠ-পাতার ঘর। লাঠি হাতে ছেড়া ইউনিফর্ম পরা দু'জন সৈনিক। আমি ভেবেছিলাম বুঝি লাঠি হাতে পাগল-টাগল হবে। পাগলদের প্রধান কাজই হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। পরে বুঝলাম এরা সরোর লোক। আমাদের গাড়ি দেখে একজন গেরিলা সৈনিক দৌড়ে গাড়ির কাছে আসতে গিয়ে তার মাথা থেকে কমবেট টুপিটি খসে পড়লো। দ্বিতীয় সৈনিকটি ছুটে এসে খেলাচ্ছলে সেই টুপিতে লাঠি মারলো। গেরিলা সৈনিকদের পক্ষেই কেবল এ জাতীয় আচরণ করা সম্ভব, কোন সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা কমবেট টুপি নিয়ে এরকম রসিকতা করবে বলে আমার মনে হয় না। আমরা গেরিলা নিয়ন্ত্রিত আইভরিকোস্টের উত্তরাংশে ঢুকে পড়েছি। উত্তরাংশে ঢোকান সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিবর্তনের ধাক্কা লাগে। পথে-ঘাটে লোকজন খুব কম। কর্মচাঞ্চল্যের তেমন কোন আভাস নেই। মানুষ, এমন কি পশু-পাখিদের মধ্যেও তেমন কোন গতি নেই। যারা হাঁটছে, তারা হাঁটছে কি হাঁটছে না এমন একটা গতি। যেন উদ্দেশ্যহীন পথিক, কোথায় যাবে সে নিজেও জানে না। দেশের গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশটির সামগ্রিক চিত্র এইসব উদ্দেশ্যহীন পথিকগুলোর মতোই। কাজ নেই, কর্ম

নেই, খাবার নেই, জীবন নেই, একটা সম্পূর্ণ স্থবিরতা সর্বত্র। এই স্থবিরতা থেকে কবে যে দেশটি বেরিয়ে আসবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষের চোখে-মুখে তেমন কোন স্বপ্নের ছিটেফোটা নেই। সবাই যেন আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। হাল-বৈঠাইন একটি নৌকা, মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে। আর নৌকার আরোহীরা বলছে, যারে নৌকা যা, যেদিক খুশি সেদিক যা।

রাস্তার দু'ধারে এলো-পাতারি গাছপালা বেড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও দু'পাশের নল-খাগড়া আর লতাগুল্মের দল রাস্তার ওপরে এসে এমনভাবে হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে যে রাস্তাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পুরো রাস্তা গিলে খেয়েছে সবুজ গাছ-লতা। এ সময় একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ হঠাৎ দু'একজন পথচারী বা সাইকেল আরোহীকে দেখা যায় হাইওয়ের একপাশ দিয়ে হাঁটছে বা সাইকেল চালাচ্ছে। গাড়ির শব্দ শুনে ওরা আচমকা কোথায় যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই আছে তো এই নেই। ভূত নাকি? পরে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ওরা আসলে গাড়ির শব্দ শুনেই পথের দু'পাশের ঘন-অরণ্যের ভেতর সুড়ুং করে ঢুকে যায়। এতো ঘন জঙ্গল, আস্ত একটা সাইকেল নিয়ে তার ভেতরে ঢোকে কিভাবে? সব এলাকাতেই কিছু লাগসই স্থানীয় প্রযুক্তি থাকে। এটাও তেমন একটা লাগসই প্রযুক্তি।

আরেকটা লাগসই প্রযুক্তির কথা বলি। আইভরিকোস্টের সর্বত্রই এটা দেখতে পাওয়া যায়। হাইওয়েতে গাড়ির স্বাভাবিক গতি ১৫০ কিলোমিটার। এই গতির একটা গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করা মানে ডিগবাজি খেয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়া। বাংলাদেশী মিলিটারির একটি থ্রি-টন এই কাজ করতে গিয়েই ৬ জন সৈনিকের জীবনাবসান ঘটেছে। কিন্তু পথের ওপর যদি কোন বেরিয়ার থাকে, তাহলে কি করা যাবে? খামতেতো হবেই। সে জন্য প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই এর সঙ্কেত পাওয়া। আইভরিয়ানরা যদি কোন গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে অন্তত আধা কিলোমিটার আগে থেকেই আশ-পাশের জঙ্গল থেকে লতা-পাতা ছিঁড়ে এনে পথের ওপর দশ/বার হাত পর পর বিছিয়ে দেয়। এই সঙ্কেত এখানকার সবাই বোঝে। পথের ওপর সবুজ পাতা দেখতে পাওয়া মানে সামনে একটা বেরিয়ার আছে। কাজেই গাড়ির গতি কমাতে হবে, গাড়ি থামাতে হবে। আমরা যখন বলাবলি করছিলাম এই প্রযুক্তিটা বাঙালীদের শেখানো দরকার। দেশে কাজে লাগবে। তখনি খেয়াল হলো আমাদের হাইওয়ের দু'পাশে সবুজ বনানী কই যে পাতা ছিঁড়ে এনে সঙ্কেত দিব? শুধুতো খা খা বিরান ভূমি। অথচ ছোটবেলায় যখন পড়তাম, পৃথিবীর সবচেয়ে সবুজ দেশের নাম বাংলাদেশ। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'। কি আনন্দেই না লাফিয়ে উঠতাম। গর্বে বুক ফুলিয়ে হাঁটতাম।

যেতে যেতে আশপাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকাছি। বন-জঙ্গল, ফাকা মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে যখনি কোন লোকালয়ে এসে ওঠে হাইওয়েটি তখনি দেখি রাস্তার পাশে সুপরিকল্পিত একটি সাইনবোর্ড, তাতে লোকালয় বা গ্রামটির নাম লেখা। আমরা এখন লুকাসো নামের একটি বড় গ্রাম পার হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকটি গ্রাম, এর নাম আল্লাকু।

আইভরিকোস্টের গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী বুআকে এসে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। বিকেলের সোনালী রোদ এসে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার আগুনলাগা ডালে। নেতানো বিকেলটা হঠাৎ যেন যৌবন ফিরে পেয়ে বকমক করে উঠছে। বুআকের পথে-প্রান্তরে, পাহাড়ের ঢালে, খাঁজে সর্বত্রই আকাশ ছোঁয়া একেকটি বৃক্ষ হাত-পা ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিশনের আঞ্চলিক সদর দফতরের কম্পাউন্ডের ভেতরেই বাংলাদেশ মিলিটারীর সিগন্যাল কোম্পানীর একটা ক্যাম্প আছে। ক্যাম্পপ্রধান মেজর মোজাক্কের আমাদের রিসিভ করার জন্য তার দলবল নিয়ে

এগিয়ে এলেন। মধ্যাহ্নভোজন আমরা সেরে এসেছি ইয়ামুসুক্রে থেকে। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার তেমন কোন ঝামেলা নেই। হাতমুখ ধুয়ে মিনিট দশেকের একটা টি-ব্রেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বুআকে দর্শনে। এরি মধ্যে বাংলাদেশী ফর্মড পুলিশ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার এডিশনাল এসপি আশরাফ টেলিফোন করে ওর ওখানে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করলেন।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাদের ক্লাস্ত টয়োটা প্রাডো দুটোকে আবার স্টার্ট দিলাম। ছুটলাম উত্তরের দিকে। মোজাক্কেরের নেতৃত্বে আমরা এসে পৌছলাম একটি বিশাল খোলা বাজারের মতো জায়গায়। বড় বড় কয়েকটি আধা-পাকা প্রশস্ত রাস্তা। দু'পাশে শত শত দোকানের পশরা। এখানে অর্ধেক দামে সিগারেট, পারফিউম এবং নানান রকমের জুতো পাওয়া যায়। কিছুদূর এগিয়ে দেখি একটা অংশে পুরোনো জুতো এবং কাপড়ের বিরাট মার্কেট। খোঁজ নিয়ে জানলাম এর অধিকাংশই চোরাই মাল। মূলত এই সুবিশাল মার্কেটের পুরোটাই চলছে স্মাগলিং এবং চোরাই মালামালের ওপর ভিত্তি করে। লাইবেরিয়া থেকে এইসব চোরাই মাল গেরিলা নিয়ন্ত্রিত আইভরিকোস্টের বর্ডার দিয়ে ঢুকে পড়ছে। কোন ট্যাক্স-ফ্যাক্সের বালাই নেই। এটাই কি তাহলে যুদ্ধকালীন সময়ের একটি দেশের প্রকৃত চিত্র? কর্নেল খালেক দুই জোড়া জুতো কিনলেন, সবাই বেশ কয়েক কার্টন করে সিগারেট কিনে নিলেন। এতো সস্তা, নিজে খাই বা না খাই বন্ধুদের উপহার দেওয়া যাবে। এইরকম একটা অভিব্যক্তি সকলের চোখে-মুখে। আমি অবশ্য কিছুই কিনলাম না। এরপর মোজাক্কের আমাদের নিয়ে গেল আরো একটি বাজারে। ওখানে মূলত কুটির শিল্পসামগ্রী পাওয়া যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জায়গাটা বেশ খোলা আর বিরান ভূমি। বাজারের একপাশে পাতা মোড়ানো ছোট একটা ন্যাডামুডু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আশ-পাশে আর কোন সবুজের চিহ্নমাও নেই। সারা আইভরিকোস্টেই এমন ড্রাই স্থান আমি আর দেখিনি।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ পাইথনের চামড়া ট্যান করছে। পাশে এক বৃদ্ধা রমনী, সম্ভবত বুড়োর স্ত্রী, কুমীরের চামড়ার ভেতরের অংশ থেকে কেটে কেটে কাঠ চাছার মতো করে চামড়ার গায়ে লেগে থাকা সাদা সাদা ফ্যাট এবং মাংস বের করছে। দু'জন ছোকরা তখন দোকানের ভেতরে, একটি সরু কাঠের মধ্যে লাগিয়ে দুই হাতে দুইদিকে টেনে সাপের চামড়া মসৃণ করছে। দলের অন্যরা এ সময়ে সাপের এবং কুমীরের চামড়ার ব্যাগ, বেল্টসহ অন্যান্য হস্তশিল্পসামগ্রী কেনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেও আমি বুড়োটোর পাশে বসে পড়লাম ভিন্ন কৌতুহল নিয়ে। প্রথমত আইভরিকোস্টে বুড়ো মানুষ খুঁজে পাওয়া একটা বিরল ঘটনা। তার ওপর এই বুড়ো তৈরী করছে হিংস্র প্রাণীর চামড়া দিয়ে সুদৃশ্য, নয়নাভিরাম হস্তশিল্পসামগ্রী। শীর্ণকায়, পাঁচফুটেরও কম উচ্চতা, চিবুকে একগাছি দাড়ি, মাড়িতে কোন দাঁত নেই বুড়োর। আর্থিক দৈন্যতার চিত্রটি ওর উদ্যম গায়ে বেশ ভালো করেই ফুটে উঠেছে। এই মুসলিম বৃদ্ধের নাম আবুবকর। সাপ-কুমীরের চামড়া দিয়ে হস্তশিল্প তৈরী ওদের পারিবারিক পেশা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই দোকানের কর্মচারী? বুড়ো তখন ক্ষেপে গেল। ওর ছোট্ট কালো বুকটা ফুলিয়ে জানালো ও-ই শেফ, মানে মালিক। দোকানের বাকী কর্মীরা সবাই ওর পরিবারের সদস্য। যে দুয়েকটা ফরাসী বাক্য শিখেছি, তার একটি হলো, কেল আজ এ তু? মানে, তোমার বয়স কত? বুড়ো জানালো ৭২ বছর। শুনে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। মাসিক আয় কত হয় জানতে চাইলেই বুড়ো একেবারে চিমসে গেল। একটা ফিকে হাসি ওর মুখে, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে। খরচপাতি বাদ দিয়ে হাজার কুড়ি সিফা, মানে বাংলাদেশী টাকায় ২ হাজার টাকা।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কোন আইন আইভরিকোস্টে আছে কি-না জানি না। তবে দেশের সর্বত্রই সাপ-কুমীরসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চামড়া, দাঁত, হাঁড় দিয়ে তৈরী শিল্পসামগ্রী পাওয়া যায়। হাতির দাঁতের সামগ্রীর জন্যতো আইভরিকোস্ট বিশ্বসেরা। যে একগাছি হাতির দাঁতের চুরি আমি রাঙামাটিতে দেখেছি

৮/৯ হাজার টাকা, সেটা এখানে পাওয়া যায় ৪/৫ 'শ টাকায়। এইসব সামগ্রী যারা তৈরী করেন সেসব শিল্পীরাও বেশ দক্ষ, ওদের কারুকর্ম বেশ নিখুঁত। তবে এ জাতীয় শিল্পকর্মের সাথে জড়িতদের প্রায় সবাই অভিবাসী। সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো, টোগো, নিজার কিংবা মালি থেকে আসা মুসলমানেরাই এই কাজগুলো করে। খাঁটি আইভরিয়ানদের এ জাতীয় কাজ করতে তেমন একটা দেখা যায় না। আইভরিকোস্টের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে উর্বর ভূমি আইভরিকোস্টে সুপ্রাচীনকাল থেকেই মালি, নিজার, টোগো, সেনেগাল, লাইবেরিয়া এবং ঘানা থেকে দলে দলে লোক আসতো কৃষিকাজ করতে এবং কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা করতে। আজ আইভরিকোস্টের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই মাইগ্রাটেড পপুলেশন।

সন্ধ্যার পরপরই আমরা আশরাফের এফপিইউ ক্যাম্পাসে পৌঁছে গেলাম। আশরাফ সাহেব আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার সুবিশাল ক্যাম্পাস দেখালেন। লাল শাক, লাউ, করল্লা আর মুলা শাকের ক্ষেত দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা। কি আশ্চর্য, তের হাজার কিলোমিটার দূরে বাংলার লাউ ঝুলছে আইভরিকোস্টের মাচায়। সাবাস বাঙালী। আমরা ছুটোছুটিতে আঙুরের থোকার মতো ঝুলে আছে নানান আকার ও আকৃতির আম। শত শত আম মাটিতে পড়ে বিছিয়ে আছে, ছোবারও লোক নেই। আইভরিকোস্টে বারো মাসই আম হয়। আমার ভায়ে পথের ওপর নুয়ে পড়ে গাছগুলো। তবে এখানকার আমে আমাদের লেংড়া আমার স্বাদ কিছুতেই খুঁজে পাই না। আমার ধারণা যে একবার রাজশাহীর লেংড়া আম খেয়েছে তার মুখে অন্য আম আর রুচবে না। প্রচুর পেপে হয় এখানে। স্বাদের দিক থেকে অসাধারণ, ভীষণ মিষ্টি। ছোট ছোট এক প্রজাতির পেপে আছে আইভরিকোস্টে, যেগুলো শুধু মিষ্টিই না, মুখে দেওয়ার সাথে সাথে এক ধরনের সুঘ্রাণে মন ভরে যায়।

নৈশভোজার বিশাল আয়োজন। যতরকমভাবে অতিথি আপ্যায়ন করা যায় তার কিছু একটু কম করেননি আশরাফ সাহেব আমাদের জন্যে। তবে সবচেয়ে বড় চমকটি তখনো অপেক্ষা করছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের তিনি নিয়ে গেলেন একটা খোলা চত্বরে, যার একপাশে দুই ফুট উঁচু একটি অন্ধকার মঞ্চ। থিয়েটার হবে নাকি? আয়োজনটাতো সে রকমই। মঞ্চের বাতি জ্বলে উঠলো। সব ধরনের আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চ, তৈরী হয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। কমান্ডার হুকুম করলেই শুরু হয়ে যাবে বাঙলা গানের এক আনন্দময় জলসা। কমান্ডার আশরাফ শুধু হুকুমই করলেন না নিজেও উঠে গেলেন এই সান্দ্য মঞ্চে আমাদের গান শোনাতে। প্রায় দুই ঘন্টা আমরা বঁদ হয়ে ডুবে রইলাম বাংলা সঙ্গীতের এক প্রাণবন্ত আয়োজনের মধ্যে, দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদের এক গেরিলা নিয়ন্ত্রিত রাজধানীতে।

সেই রাতে আমি আর ঘুমুতে পারলাম না। পার্থক্যগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম উত্তর আর দক্ষিণের। দক্ষিণে দেশের সর্ববৃহৎ এবং আধুনিক শহর আবিদজান অবস্থিত। যে শহরে বসবাস করে দেশের মোট এক কোটি আশি লক্ষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। আবিদজানের মানুষ জীবনের জটিল যন্ত্রণা কাধে নিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি। আর উত্তরের মানুষের মধ্যে নেই কোন তাড়াছড়ো, জীবনে নেই তেমন কোন জটিলতা। সামান্য আয়ের মধ্য দিয়ে জীবন চালানোর কৌশলটা ওদের জানা। ওদের চোখে-মুখে তেমন কোন হতাশার ছাপ নেই। তেমন কোন স্বপ্নের ফেনাও নেই চোখে-মুখে। শুধু আবুবকর নয়, বুআকের রাস্তায় নামাজের আগে-পরে তিন-চারজন বুড়ো মানুষের বেশ অনেকগুলো ছোট ছোট দলই চোখে পড়লো। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসন যে এইডস প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় এবং কার্যকর পদ্ধতি, বুআকের রাস্তায় এই বুড়োদের সরব উপস্থিতি তারই একটি ইন্ডিকেটর। অপেক্ষাকৃত খ্রীস্টান অধ্যুষিত আবিদজান শহরে মাসেও একজন বুড়ো মানুষ চোখে পড়ে

না। এই শহরের মানুষকে জল-বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কোন পয়সা দিতে হয় না। কে বিল নেবে? এখানে নেই কোন সুসংগঠিত অফিস, নেই কোন ব্যাংক, নেই কোনরকম আর্থিক লেন-দেনের প্রতিষ্ঠান। মাঝে মাঝে গেরিলা নেতাদের লোকজন অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। ওদের হাতে কিছু ধরিয়ে দিতে হয়। গেরিলাদের আয়ের একমাত্র প্রকাশ্য উৎসই হলো চাঁদাবাজি। অপ্রকাশ্য অনেক উৎস আছে। এই দেশের সরকারী বিরোধী দুই দলেরই শেকড় ফ্রান্সে। ফ্রান্সের এক পার্টি আইভরিয়ান সরকারকে সমর্থন করলে অন্য পার্টি সমর্থন করে গেরিলাদের। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই বৃহৎ পরাশক্তি ফ্রান্স তাদের সবচেয়ে উর্বর উপনিবেশ আইভরিকোস্টে জিইয়ে রেখেছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। ফরাসী জাতীয় আয়ের ৩১ শতাংশ আসে আইভরিকোস্ট থেকে, এইরকম একটা কথা এদেশে প্রচলিত আছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা বেশ দ্রুত তৈরী হয়ে নিলাম। সময় নষ্ট করা যাবে না। আজ আমরা যাবো এখান থেকে আরো ৫০ কিলোমিটার উত্তরে, কাতিওলায়। বেশ অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করেছিলাম, এক বাংলাদেশী যুবক অনেক বছর আগে এই দেশে এসে স্থায়ী আবাস গেড়েছেন। এখন তিনি আর একা নন, ডাল-পালা বিস্তার করে শেকড় গেড়েছেন আইভরিকোস্টে। সেই যুবকের নাম মনির, মনিরুজ্জামান। কাতিওলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম সকাল দশটায়। সহযাত্রীরা হলেন কর্ণেল খালেক, কর্ণেল দিদার, মেজর মোজাক্কের এবং আমাদের জিআইএস ইউনিটের জহরুল ইসলাম। মনির সাহেবের সাথে ফোনে কথা হয়েছে, তাঁর ওখানে দুপুরে খাবো। চমৎকার পিচঢালা প্রশস্ত সড়ক, সুঁইয়ের মতো সোজা। রাস্তায় তেমন খানাখন্দও নেই। গত পাঁচ বছরে এসব রাস্তায় কোন কাজ করা হয়নি। আশ্চর্য ব্যাপার, এতো স্মুথ থাকে কি করে? একটা কারণ হতে পারে যে রাস্তাগুলো তেমন বিজি না। আমরা গাড়ি চালাচ্ছি প্রায় দশ মিনিট ধরে এখনো পর্যন্ত অন্য কোন গাড়ির সাথে দেখা হয়নি। তাই বলে এতো ভালো থাকবে? ঝড়-বৃষ্টিতো হচ্ছে। যতো উত্তরে এগুচ্ছি, ল্যান্ডস্কেপ ততোই পাহাড়ি হয়ে উঠছে। পাহাড়ি রাস্তা হবার কারণে বৃষ্টির পানি রাস্তার ওপর জমে থাকে না। রাস্তা ভালো থাকার এটাও একটা কারণ। তবে কারণ যতোই থাকুক মূল কারণ একটাই, ওদের কাজের মান অনেক ভালো। কোন ফাঁকি-ঝুঁকি আছে বলে মনে হয় না।

পথের দুপাশে ঘন অরণ্য। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে আমরা ছুটে চলেছি। সেগুন, মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল, জারুল, কাকাও, পাম, রাবারসহ আরো শত শত জাতের গাছ-গাছড়ায় সমৃদ্ধ এইসব বনাঞ্চল। আর আছে শত শত বুনো আমগাছ, পাতার চেয়ে আমের সংখ্যা বেশি। থোকা থোকা আম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমগাছগুলিকে দেখলে মনে হয়, ওরা যেন কদাচিৎ গাড়ি নিয়ে আসা পর্যটকদের মিনতি করে বলছে, দুটো আম ছিড়ে আমাকে ভারমুক্ত কর হে মানুষ। অনেকক্ষণ পর একটু সমতলে এসে পড়লাম। আর সাথে সাথে চোখে পড়লো একটি সুবিশাল মহিষের পাল। তাদের ভিড়ে এক রাখাল পুরুষ, মিশে আছে ওদেরই রঙের ভেতর। সমতলে নেমে আসতেই একটা দিগন্ত বিস্তৃত আনারসের মাঠ দেখতে পেলাম। আইভরিকোস্টের আনারস বিশ্বখ্যাত। আনারসকে ওরা বলে আনানা। এতো সুমিষ্ট আনানা দুনিয়ার খুব কম দেশেই উৎপন্ন হয়। এখানকার চাষাবাদ প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত আধুনিক। চাষাবাদের জন্য ওরা কাঠের লাঙ্গল আর গরু-মহিষ ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে আধুনিক যন্ত্রপাতি। যে কারণে এক একটি ফসলের মাঠ মাইল মাইল দীর্ঘ এবং মাঝখানে নেই কোন ছোট ছোট আইল জাতীয় বেরিয়ার।

অরণ্যের ভেতর হঠাৎ জেগে উঠলো একটি ধূলিমলিন শহর। যে শহরের প্রায় সবগুলো দালানের রঙই হলুদ। আর হলুদ রঙটা ডুবে আছে ধূসর ধুলার আবরণের ভেতর। দালানের সংখ্যাও হাতে গোনা কয়টি, বাকী সব মাটির বাড়ি-ঘর। বিস্তীর্ণ সবুজের প্রচুর্য পেরিয়ে যখন একটি দরিদ্র গোছের কিন্তু বেশ

বড়সড় লোকালয়ে এসে পৌছলাম, তখন আন্দাজ করছি আমরা কাতিওলায় এসে গেছি। সামনের গাড়ি থেকে মেজর মোজাকের অয়্যারলেসে জানালেন, এটাই কাতিওলা।

বাড়ির সামনে তিনটা বড় বড় আকিস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে, বাড়ির আঙিনায় আকিস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পের বেশ বড়-সড় একটি ফ্যাক্টরি। মনির সাহেবের ছোট ভাই আমাদের রিসিভ করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হাসিতে উদ্ভাসিত মনিরুজ্জামান বসে আছেন লিভিংরুমের হুইল চেয়ারে, পাশে তার সুন্দরী, উচ্ছল, প্রাণবন্ত স্ত্রী। খরগোশের বাচ্চার মতো সারাঘর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একটি ছয় বছরের শিশু, ওদের একমাত্র কন্যা। বাংলাদেশের বরগুনা জেলার অধিবাসি মনিরুজ্জামান এদেশে আসেন নব্বুয়ের দশকের গোড়ার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পাঠ শেষ করে উন্নত জীবনের সন্ধ্যানে এক বন্ধুর হাত ধরে পাড়ি জমান কেনিয়ার নাইরোবিতো। কিন্তু ওখানে তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। এতে দমে যাননি মনির। বাংলাদেশী তৈরী পোষাকের কিছু নমুনা নিয়ে চলে যান তানজানিয়ায়। ভালোই ব্যবসা চলছিল তানজানিয়ায়। কিন্তু বিধি বাম। ওখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাকে ব্যবসা ফেলে চলে যেতে হয়। কিছুদিন দেশে বেকারত্বের বোঝা কাধে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। তারপর আবার ফিরে আসেন কেনিয়ায়। নতুন উদ্যমে শুরু করেন গার্মেন্টস-এর ব্যবসা। এ সময়ে তাকে সহযোগীতা করেন কেনিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর ডালিম। কিন্তু তেমন একটা সুবিধা হচ্ছিলো না, কিছুতেই ভাগ্যদেবী ধরা দিচ্ছিলো না। এক সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মনির বসে আছেন নাইরোবির এক রেস্টুরেন্ট-এ। সামনের টেবিলে এক কানাডিয়ান বুড়ো। উৎসাহী মনির এগিয়ে যায়। পরিচয় হয় কানাডিয়ানের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে মনির বলে তার উচ্চাকাংখার কথা, তার সফলতা ব্যর্থতার কথা। বুড়ো দেখে এই যুবক খুব আত্মবিশ্বাসী, তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শোন, আটলান্টিকের ওপারে জ্যামাইকাতে একটা ফল উৎপন্ন হয়, এর নাম আকিস। আমি সেই ফল প্রক্রিয়াজাত করে আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপের বাজারে বিক্রি করি। ভাল ব্যবসা, প্রচুর লাভ। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী জ্যামাইকার বাগানে ফল উৎপন্ন হয় না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি আকিসের জন্মস্থান হলো আফ্রিকার কোন একটি দেশে। অনেক বছর ধরে আমি আফ্রিকার নানান দেশে ঘুরছি কিন্তু আজো খুঁজে পাইনি কোথায় সেই আকিসের খনি। আমি নিশ্চিত এই মহাদেশেই এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শত শত মাইল এলাকা জুড়ে আছে আকিসের অরণ্য। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, উদ্যম হারিয়ে ফেলছি। তুমি কি আমার অসমাপ্ত কাজটা করবে? খরচপাতি সব আমি দেব।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায় মনির। শুরু হয় নতুন জীবন। আকিসের সন্ধ্যানে আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এক বাংলাদেশী যুবক। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হয় ঘানার রাজধানী আক্রায়। ঘানার এক লোক বলে, আমি সম্ভবত আইভরিকোস্টে এইরকম গাছ দেখেছি। ব্যাস, মনির ছোট্টেন আইভরিকোস্টের উদ্দেশ্যে। আবিদজানে এসে তিনি এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নেন, যাবেন কোন এক হোটেলে। ড্রাইভার জানতে চায় হোটেলের নাম আর আকিস আবিষ্কারের উত্তেজনায় অস্থির মনির বলে আকিসের কথা। ড্রাইভার ছবি দেখে বলে, আমি চিনি এই গাছ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে বলে মনির। রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে দেখাতে শুরু করে আকিসের ভিডিওচিত্র। ড্রাইভার বলে, আমার বাড়ি উত্তরে, কাতিওলায়। ওখানেই আছে এই জংলা গাছ। এই গাছের গোটা খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তুমি এই পাগলা গোটা খুঁজছো কেন?

তখনি, এই ট্যাক্সি নিয়েই, মনির ছোট্টে কাতিওলার উদ্দেশ্যে।

জীবনের এই সাফল্যের গল্প বলতে বলতে চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে মনিকুঞ্জামানের। আমরা আরো জানতে চাই। এরপর কি হলো?

আমি ফোন করি সেই কানাডিয়ান বুড়োকে। ঘুরে ঘুরে আকিসের বাগান দেখি। কিছু ফল, পাতা ছিড়ে নিয়ে ছুটে যাই নাইরোবিতে। তিনি নিশ্চিত হন, এটাই সেই ফল যা তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন বহু বছর ধরে। এরপর আমরা আবার আসি কতিওলায়। শুরু করি এখানে আকিস প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন। প্রায় দেড় বছর ধরে ফ্যাক্টরী স্থাপন করি। এরপর প্রোডাকশনে যাই।

তিনি জানান, প্রতি ক্যান আকিসের উৎপাদন খরচ পড়ে এক ডলার আশি সেন্ট, কানাডিয়ান বুড়ো তাকে দেয় দুই ডলার। এতে করে তার মাসে প্রায় ৫ হাজার ডলার আয় হয়। উৎপাদন আরো বাড়তে পারলে আয় আরো বাড়বে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং কানাডার মার্কেটে এর রয়েছে বিশাল চাহিদা। সাপ্লাই যতো খুশী বাড়ানো যাবে, চাহিদা ব্যাপক। পাঁচ বছর আগে মনিকুঞ্জামান সাহেব আইভরিয়ান সরকারের কাছ থেকে ১০০ হেক্টর জমি লিজ নিয়ে আকিসের চারা বুনছেন। সেগুলিতে এখন ফল আসতে শুরু করেছে। এই বাগান থেকে পুরোমাত্রায় ফল আহরণ করতে পারলে ওর মাসিক আয় দাঁড়িয়ে যাবে বিশ হাজার ডলার।

মনির-সাফল্যের একটি করুণ ট্রাজেডি আছে। সবকিছু গুছিয়ে এনে তিনি যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঠিক তখন তার জীবনে নেমে আসে এক অন্ধকার অধ্যায়। সেই অপয়া বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি কয়েক মাইল দূরের একটি বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির পানিতে ডুবে থাকা একটি গর্তে পড়ে গাড়ি উল্টে যায়। তখন থেকেই তিনি পঙ্গুত্বের শিকার। এখন তার জীবন কাটে হুইল চেয়ারে বসে। শুধু তাই না, নিজের হাতে তুলে খেতেও পারেন না। ভাবী তাকে ছায়া দিয়ে রাখেন সারাদিন। সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম, ফ্যাক্টরীর তদারকী করেও স্বামীর পাশে তিনি অবধারিত এক ছায়ামানুষ।

দুপুরে খেতে বসে বহুদিন পর এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে এক প্রকৃত বাংলা খাবারের সুঘান পাই। পাবদা মাছ, ইলিশের মতো এক রকমের মাছ রান্না করেছেন ভাবী কচু দিয়ে, ডাল, কয়েক রকমের ভর্তা, বেগুন ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট, তারপরে সবশেষে দুধভাত। খাওয়ার পরে আম-কাঁঠালের এক মহাসমারোহ।

আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটি গ্রাম দেখতে। সেই একই চিত্র। এই গ্রামে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু পানি নেই। এক খা খা মরুভূমি। পানির একমাত্র উৎস কিছু গভীর কুয়ো আর দূরের নদী। কিন্তু এসব নিয়ে তেমন পরিকল্পিত কোন স্কেভ নেই। এই গ্রামের শিশুরা কেউ স্কুলে যায় না। ছোট ছোট মাটির ঘর, একটার সাথে আরেকটা গায়ে গায়ে লাগানো। বাড়ির আঙিনায় আম আর পেপে ছাড়া অন্য কোন গাছ-গাছড়া নেই। আমার মনে হলো আফ্রিকার মানুষেরা বুঝি গাছপালাকে ভয় পায়। যেখানে লোকালয় সেখানে বিরাগভূমি, তাছাড়া সারাদেশ বন-জঙ্গলে ঢাকা।

একদল শিশুর সাথে কথা বললাম। জানতে চাইলাম, তোমরা আনন্দ-উল্লাস কর না? ওরা জানালো কেউ মারা গেলে উৎসব হয়, গান-বাজনা হয়, সারারাত নাচ হয়। যুবক পুরুষেরা দাঁত বের করে হাসে এ সময়, বলে স্থানীয় মদের কথা। শেষকৃত্যনুষ্ঠানে ওরা সারারাত মদ্যপান করে মৃতের রেখে যাওয়া টাকায়। এটাই আইভরিকোস্টের ট্রেডিশন। শহরের লোকেরা এইসব না মানলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনো এই ট্রেডিশন পালন করা হয়। একটি পূর্ণরাত মৃতদেহকে উঠানের মাঝখানে রেখে চারপাশ ঘিরে

গ্রামবাসীরা নাচ-গান, হৈ-ছল্লোড় করে আর স্থানীয় চোলাই মদ পান করে। মৃতের রেখে যাওয়া টাকায় খাওয়া-দাওয়া আর মদ্যপান হয়। উত্তরাধিকারের কোন সিস্টেম এখানে নেই। ওদের মূল খাবার কাসাবা। সাথে মাছ খেতে পছন্দ করে তবে বেশীরভাগ গ্রামবাসীই জানায় মাছ তেমন একটা মিলে না। লাল মরিচের ভর্তা দিয়ে কাসাভা সেদ্ধ খেয়েই গ্রামের লোকগুলোর স্বপ্নহীন সাদা-কালো জীবন কেটে যায়। তাই বলে কাউকে অসুখী মনে হলো না। এই জীবনের বাইরেও যে একটা সুন্দর জীবন থাকতে পারে সে সম্পর্কে ওদের কোন ধারণাই নেই। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম আবিদজানে গিয়েছেন কখনো? ওরা মাথা নেড়ে জানালো, যায়নি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওরা বলতে চাইছে আবিদজানে যাওয়া কোন জরুরী বিষয় না।

পরদিন ভোরে আবিদজানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ফিরে যেতে হবে ৪০০ কিলোমিটার পথ ড্রাইভ করে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৭ নভেম্বর, ২০০৬

